ন্যাক – এ

লেখনী

মুরলীধর গার্লস কলেজ

বাংলা বিভাগ

লেখনী

মুরলীধর গার্লস কলেজ

বাংলা বিভাগ
বিভাগীয় মুখপত্র
২০২৩ - ২৪

সম্পাদিকা	ঃ শ্রেয়শ্রী দাস মুখার্জী (পঞ্চম বর্ষ, সাম্মানিক)
সহঃ সম্পাদিকা	ঃ মল্লিকা নস্কর (তৃতীয় বর্ষ, সাম্মানিক)
সহযোগী সম্পাদকমন্ডলী (ছাত্রী প্রতিনিধি)	ঃ অনন্যা রায় (তৃতীয় বর্ষ, সাম্মানিক) সঞ্চিতা পাল (তৃতীয় বর্ষ, সাম্মানিক) শ্রেয়া প্রামাণিক (তৃতীয় বর্ষ, সাম্মানিক)
পত্রিকা উপদেষ্টা	ঃ অধ্যাপিকা শুক্লা পাঠক ডঃ নীহার কান্তি মন্ডল অধ্যাপিকা অপর্ণা সেনগুপ্ত ডঃ মণিশংকর অধিকারী ডঃ শম্পা বসু
পত্রিকা অলংকরণ	ঃ শ্রেয়শ্রী দাস মুখার্জী

লেখনী

সূচীপত্র ঃ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

১। রবীন্দ্রসাহিত্য চলচ্চিত্রায়ণে ঃ তপন সিংহ - সুচরিতা ঘোষ ১

২। এবারের সংক্রান্তি - শ্রেয়শ্রী দাস মুখার্জী ৫

৩। বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থান - মল্লিকা নস্কর ৭

৪। বাংলা গোয়েন্দা গল্পের ধারা ঃ ইতিহাস ও বিবর্তন - অধ্যাপিকা শুক্লা পাঠক ১১

৫। হাস্যভ্রমণে টাকী - শুভশ্রী সরকার ১৭

৬। খেলাধুলার গুরুত্ব - অনন্যা রায় ২০

৭। অঙ্ক - সঞ্চিতা পাল ২২

৮। আমিই সে... - শুভশ্রী সরকার ২৩

৯। হারানো চিঠি - শ্রেয়া প্রামাণিক ২৪

১০। সমাপ্তি পর্ব - সুচরিতা ঘোষ ২৫

সম্পাদকীয়

সময় বয়ে যায়। ‘লেখনী’-রও বয়স বাড়ে। সেই কবে গুটি গুটি পায়ে পথ চলা শুরু করেছিল। প্রায় প্রতি বছর নিয়ম করে ভাবনার পরতগুলো এগিয়ে চলে। নানা জনের নানা মতের নানা কথা। যে কথা মরমে বাজে। সে কথার সুর লাগি ধেয়ে চলে প্রাণ। বর্ষে বর্ষে। ভালো-মন্দে। অবিরাম। লেখার উৎসুক লাগি।

সবুজ মনে সবুজ ভাষা। এই নিয়ে দিন এগোয়। কিন্তু কোথায় যেন ‘তার’ কেটে যাওয়ার হাতছানি। যাদের জন্য লেখনী তাদের অনেকের মধ্যে আগেকার মত সেই উচ্ছ্বলতা নেই। ধার কমে গেছে লেখায়। আগ্রহ হারিয়েছে অনেকে। গুণগত মান হয়েছে লোপাট। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। কিন্তু তাতে ঠিক মত মুখ দেখা যাচ্ছে না।

তবুও আমরা থেমে থাকি নি, হারিয়ে যাই নি। আমাদের মুরলীধর গার্লস কলেজের বাংলা সাম্মানিকের বিভাগীয় মুখপত্র ‘লেখনী’ আজও ‘পথ চলাতেই আনন্দ’ মনে করে। তাই সকলে মিলে তাকে প্রাণরসে পরিপুষ্ট করে তোলে। নবীর লেখকেরা আবেগ-ভালোবাসায় নিজেদেরকে জারিত করে। চারিদিকে যে দিশাহীনতা, তার মধ্যে পথনির্দেশ খোঁজা। ছাত্রদরে গান অন্ধকারের বুক চিরে আলোর পথে যাত্রা করে। থামে না।

এবারের ‘লেখনী’ সীমিত পরিসরে কয়েকটি লেখায় সমৃদ্ধ। আরও কিছু লেখা থাকলে ভালো হত। কিন্তু যা হয় নি, তাকে নিয়ে মন খারাপ করা নয়। চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। একদল যায়, আরেক দল আসে। সবই নিয়মের ঘেরাটোপে বাঁধা। শিক্ষায়তন থাকবে, থাকবে ‘লেখনী’ও। উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা পথ দেখাবে। সমৃদ্ধ হবে ‘লেখনী’। এই ভাবনাকে পাথেয় করে আমাদের পথ চলা।

রবীন্দ্রসাহিত্য চলচ্চিত্রায়ণে ঃ তপন সিংহ

সুচরিতা ঘোষ

সিনেমার সঙ্গে তপন সিংহের সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিনের। ছাত্রজীবনেই নিয়মিত বিদেশি ছবি দেখার অভ্যাস তাঁর তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এসপ্ল্যানেডের বিভিন্ন হলগুলিতে যখন নতুন নতুন ছবি মুক্তি পাচ্ছিল, তখন এই তরুণটি এক হল থেকে অন্য হলে ঢুকে পড়তেন সিনেমা দেখার জন্য। মনোযোগী ছাত্রের মত সিনেমার সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় চিত্রনাট্য, ফোটোগ্রাফি, সংগীত, অভিনয় ও সম্পাদনা - প্রতিটি বিষয়কেই তিনি বোঝার চেষ্টা করতেন। সিনেমাপাগল এই তরুণটির চোখে তখন সৃজনশীলতার স্বপ্ন যা পরবর্তীকালে বাস্তবায়িত হয়েছে চল্লিশটি সফল চলচ্চিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে।

'অঙ্কুশ' থেকে 'হুইল চেয়ার' - এই দীর্ঘ সময়ের যাত্রাপথে তপন সিংহ সমাজের বিভিন্ন সমস্যার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর চলচ্চিত্রে। কখনও ক্যামেরা তাক করেছেন ঘরছাড়া বাউন্ডুলে কিশোর তারকাদের দিকে, আবার কখনও রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে ছবি করেছেন। কখনও বা সামাজিক আকাল উঠে এসেছে তাঁর ছবিতে। বিভিন্ন সাহিত্যিকের বিভিন্ন উপন্যাস বা ছোটোগল্পকে যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাবুলিওয়ালা, ক্ষুধিত পাষাণ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, বনফুলের হাটে বাজারে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের টানাপোড়েন তাঁর চলচ্চিত্রে এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। তাঁর প্রতিটি শিল্প সৃষ্টির মধ্যেই আছে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সচেতন সমাজমনস্কতা।

তপন সিংহ প্রথম জীবনে Oxford-এর Pineword Studio-তে Sound Engineer হিসেবে কাজ করতেন। পরবর্তীকালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প 'ইতিহাস' নিয়ে তিনি প্রথম সিনেমা তৈরি করেন। তিনি তাঁর সিনেমাগুলিতে সঙ্গীতের উপরে বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনা করতেন পঙ্কজকুমার মল্লিক, শচীনদেব বর্মণ, রবিশঙ্কর, হেমন্ত মুখার্জী প্রমুখ। তিনি দেশি সঙ্গীতের ন্যায় প্রচুর পাশ্চাত্য সংগীতে বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। তপন সিংহ তাঁর ছবির মান উন্নয়ন করার জন্য হিন্দী ছবির শিল্পীদের আগমন ঘটিয়েছিলেন।

তপন সিংহ সব সময় চিত্র পরিচালনার কাজে চেষ্টা করতেন গল্পটা যাতে ভালো হয়, দর্শক যেন সিনেমা দেখে তাকে খুব পরিচিত বা কাছের গল্প মনে করে। এক্ষেত্রে তিনি বিদেশি চিত্র পরিচালকের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সাহিত্য ও চলচ্চিত্র একে অপরের পরিপূরক। কারণ চলচ্চিত্র কখনোই সাহিত্যের বাস্তব রূপ ধারণ করতে পারে না।

অপরদিকে সাহিত্য পাঠের পরেও সে অতৃপ্তি থেকে যায়। তাকে চোখের সাহায্যে উপলব্ধি করলে তার গানেরও অনেক উন্নতি ঘটে।

তপন সিংহের পরিচালিত মোট ছবির সংখ্যা চল্লিশ। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, ''চল্লিশটি ছবির মধ্যে বিশেষ কোনো ছবিকে আমি প্রিয় বলে চিহ্নিত করতে পারব না। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা' ও 'ক্ষুধিত পাষাণ' ...... পরিচালনা করে আমি তুলনামূলকভাবে অন্যান্য ছবি অপেক্ষা খানিকটা বেশি আনন্দিত হয়েছি।

এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটোগল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ' চলচ্চিত্রায়ণে তপন সিংহের কথা কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। 'ক্ষণিকের অতিথি' নির্মাণের পর কী সিনেমা করা যায় এ নিয়ে ভাবলে সে সময় গ্র্যান্ড হোটেল থেকে হেমেন গাঙ্গুলী ফোন করে তপন সিংহকে দিয়ে সিনেমা করাতে চায় বলে তাকে গ্র্যান্ডে আসতে বলে এবং তিনি তপন সিংহকে একথাও বলেন যে, তিনি তাকে দিয়ে 'ক্ষুধিত পাষাণ' সিনেমাটি বানাতে চান।

তপন সিংহ সঙ্গে সঙ্গে গ্র্যান্ড হোটেল রওনা দেন। তারপর শুরু হয় স্ক্রিপ্ট লেখা। তপন সিংহ এবার প্রথম সেটের স্ক্রিপ্ট গ্রাফ করে তৈরি করেছিলেন। কাহিনির গোটা বাড়িটার ছক করে নিয়েছিলেন মনে মনে। সত্যজিৎ রায় এই ব্যাপারে তপন সিংহকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। ক্ষুধিত পাষাণের লোকেশন দেখতে গিয়ে তপন সিংহ ভূপালে গিয়েছিলেন নবাব বাড়ির লোকেশন দেখতে। বাড়িটা দেখে শ্যুটিং করার জন্য তার পছন্দ হলেও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় ওই বাড়ির বড়ো বড়ো উঁচু উঁচু পিলার। কারণ রাতে ওই বিরাট থাম আর বারান্দায় আউটডোরের নাইট সিকোয়েন্স সিনেমা বানানোটা বড়ো কঠিন কাজ। এই কথা তিনি তাঁর বিশেষ বন্ধু সত্যজিৎ রায়কে জানালে তিনি আর্চ আর পিলার দিয়ে একটি ডিজাইন করে তপন সিংহকে দিয়েছিলেন। সেই ডিজাইনটা ছিল ফতেপুরী আর্চ। সেটি হাতে পেয়ে তপনবাবু সুনীতি মিত্র'র হাতে তা নির্মাণের জন্য দিয়েছিলেন।

এই সিনেমাটি নির্মাণের জন্য পরিচালক থেকে শুরু করে অভিনেতা এবং সিনেমার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত লোক প্রচুর পরিশ্রম করেছিল। নির্মিত হবার পর ১৯৬০ সালের ৬ মে মিনার, বিজলী, ছবিঘর ও শহরতলির অন্যান্য সিনেমা হলে মুক্তি পেয়েছিল ক্ষুধিত পাষাণ। সিনেমাটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ক্ষুধিত পাষাণের অভিনেতা রাধামোহন ভট্টাচার্য সেরা পার্শ্বনেতার পুরস্কারও পেয়েছিল। উপরাষ্ট্রপতি ড. রাধাকৃষ্ণণের থেকে তিনি স্মারক সম্মান পেয়েছিলেন। এছাড়াও পুরস্কৃত হয়েছিলেন অরূন্ধতী দেবী, প্রযোজক হরেন গাঙ্গুলী, পরিচালক তপন সিংহও।

রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথের যে বাংলোতে বসে ক্ষুধিত পাষাণ রচনা করেছিলেন, সেখানে তপন সিংহকে লোকেশন নির্মাণের জন্য যেতে হয়েছিল। ফিচার সিনেমা হিসেবে দ্বিতীয় সেরা জাতীয় চলচ্চিত্রের পুরস্কার পেয়েছিল এই সিনেমাটি। দিলীপ রায় ক্ষুধিত পাষাণে মোঘলরাজ

হিসেবে অভিনয় করেছিলেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ট্যাক্স কালেক্টর হিসেবে অভিনয় করেছিলেন। অরুন্ধতী দেবী নর্তকীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। অবচেতন মনে মৃত্যুর পরেও কিছু আত্মাদের যে অতৃপ্ত ইচ্ছার আগুন থাকে রাজমহলের পাথরের খাঁজে খাঁজে। ট্যাক্স কালেক্টর রাতে অবচেতন মানসে তারই সঙ্গী হতেন এবং তা নিয়েই ক্ষুধিত পাষাণের কাহিনি।

একটি রাজমহলের ওপর ওরকম একটা কাহিনি চিত্রিত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ক্ষুধিত পাষাণের সেই কাহিনিকেই তপন সিংহ সিনেমায় বাঙ্ময় করেছেন এবং অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, হেমেন গাঙ্গুলী, রাধামোহন ভট্টাচার্যের মাধ্যমে পরিচালক পুরনো সময়কে জীবন্ত করার চেষ্টা করেছেন। স্বাভাবিক ও অশরীরি মানুষের সম্পর্কের দ্বন্দ্ব এবং শেষ পর্যন্ত অশরীরী আত্মাদের সংস্পর্শে থেকে ফিরে আসাই এই সিনেমার প্রধান বিষয়বস্তু।

ক্ষুধিত পাষাণের নিদর্শনরীতিতে প্রযুক্তিগত নৈপুণ্যে তেমন ত্রুটি নেই। ফলে সিনেমায় নির্মিত কাহিনি বিশ্বাসযোগ্য হতে পেরেছে। মেহের আলির চিৎকার 'ভাগো ভাগো সব ঝুটা হ্যায়'-এর মতো আদিগন্ত প্রান্তরে ঘোড়া ছোটানোর দৃশ্য এ সিনেমায় অনেকবার এসেছে। যেন ঐ দৃশ্য পুরোনো সময় ও কাহিনির রাজকীয় টানাপোড়েনকে স্পষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

ক্ষুধিত পাষাণ সিনেমায় যারা অভিনয় করেছেন এবং যে অভিব্যক্তিতে অভিনয় করেছেন তাতে অসংগতির স্থান নেই। বাইরে থেকে পাথরের যে প্রাসাদ মৌন ও মূক সেই প্রাসাদে অবগাহন করলে বোঝা যায় ঐ প্রাসাদ তার ভিতরের কথা বলবার জন্য কী ভীষণ রকমের ক্ষুধিত।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, রবীন্দ্রকাহিনি অনুযায়ী তপন সিংহ সিনেমা তৈরি করলেও তিনি তার সুবিধা মতন দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য এই কাহিনির কোথাও কোথাও প্রভেদ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর ভাষাও বর্ণময়, চমৎকারিত্ব আছে কিন্তু এই কাহিনি ছোটো আয়তনের। কিন্তু সিনেমার 'ক্ষুধিত পাষাণ' পূর্ণ দৈর্ঘ্যের অর্থাৎ বেশি সময়ের এবং কাহিনিও কিছুটা বর্ধিত চেহারার।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে ট্যাক্স কালেক্টর সাহেব (সৌমিত্র)-এর (ছবি বিশ্বাসের) বাড়িতে যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া করা, সাজঘরে গিয়ে নবাবী পোষাক কিনে আনা এসব নেই কিন্তু সিনেমাতে ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য এভাবে বর্ধিত করা হয়েছে।

রবীন্দ্রকাহিনিতে বরিচের প্রাসাদে নদীর প্রসঙ্গ ছিল। কিন্ত সিনেমাতে পুষ্করিণীর কথা এলেও নদীর কথা আসেনি। সিনেমায় যতটা গা ছমছমে ভয়ার্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তপন সিংহ রবীন্দ্রনাথের গল্পে তা নেই।

গল্পে পেইন্টিং-এর গ্যালারি দেখতে গিয়ে ইরানি মেয়ের পোর্ট্রেট দেখা এবং পরে তা জীবন্ত হওয়ার কথা নেই, কিন্তু সিনেমায় আছে। এবং ইরানি বাজার দৃশ্য, সমুদ্র সৈকত দৃশ্য, এসব

ঘটনাও সৃজন করা হয়েছে। আসলে সিনেমা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের কারণে সাহিত্যে জনসৃজন করতে পারে।

ট্যাক্স কালেক্টর সাহেব ওই প্রাসাদে রাত্রিবাস করেছিলেন এবং যে সব অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন, তারই বিবরণ আছে 'ক্ষুধিত পাষাণ' সিনেমায়। সবটাই সাহিত্যের বিবরণ নয়। সিনেমার মনোরঞ্জনের সূত্র মেনে অনেক একক দৃশ্য সৃজন করা হয়েছে তাতে সাহিত্যের ক্ষুধিত পাষাণও বিপন্ন হয়নি আবার তা কালজয়ী সিনেমাও হতে পেরেছে। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ নির্মাণে সময় ও খরচ কম লেগেছে। কিন্তু তপন সিংহ ক্ষুধিত পাষাণ নির্মাণে অনেক বেশি সময়, অনেক বেশি খরচ এবং অনেক বেশি মানুষের অংশগ্রহণ দরকার হয়েছে। তাই পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, সাহিত্য যত সহজে নির্মাণ সম্ভব, চলচ্চিত্রে তত সহজে নির্মাণ করা সম্ভব নয়। আগামী দিনেও রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়ে হয়তো অনেকেই সিনেমা রচনা করবেন তবে রবীন্দ্র সাহিত্যের ভাব ও অনুভব বজায় রেখে তিনি যে সিনেমা নির্মাণ করেছিলেন তা সত্যিই রবীন্দ্রসাহিত্য ও সিনেমায় উৎকৃষ্ট সংযোজন।

এবারের সংক্রান্তি

শ্রেয়সী দাস মুখার্জী, পঞ্চম সেমেস্টার

‘‘ইস্! সাড়ে দশটা বাজে। আজ বড্ড দেরি করে ফেললাম,’’ বলতে বলতে তাড়াতাড়ি করে ব্যাগের মধ্যে খাতা ঢুকিয়ে নিল রাইমা।

‘‘মা আমি আসছি। আজ বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হবে, দুটো বাচ্চাকে পড়ানোর আছে, চিন্তা করবে না।’’

রাইমাকে জুতো পরতে দেখে রমা দেবী বলেন, ‘‘ওমা! সে কী কথা? সেই কখন বাড়ি ফিরবি, বেলা ১১টায় বেরোচ্ছিস কিছু খেয়ে তো যাবি। আয়, আয় বস্ এদিকে।’’ মায়ের স্নেহের বকা শুনে কিছুটা বাধ্য হয়েই একটা মাত্র পাউরুটি হাতে নিয়ে খেতে খেতে রাইমা বলে, ‘‘আসছি আমি।’’

রাইমা গড়িয়া থেকে সৃজার সঙ্গে ট্রেনে করে যায় শিয়ালদহ ওদের কলেজে।

- ‘‘কিরে কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, খেয়াল আছে কটা বাজে? আমাদের না ১টা থেকে ক্লাস।’’ বেশ কড়া গলায় বলে সৃজা রাইমার উদ্দেশ্যে। রাইমা সৃজার সঙ্গে ট্রেন আসার সময় দেখতে দেখতে বলে, ‘‘আর বলিস না, আজ বড্ড দেরিতে.... (মোবাইল ফোন বেজে ওঠার শব্দ) হ্যালো! হ্যাঁ বলো?’’

- ‘‘তোর মনে আছে তো কাল কি? আজ কিন্তু মনে করে সমস্ত জিনিস কিনে আনবি। তোর বাবা বড়ো সাধ করে এই দিনটা পালন করত, আসলে নিজে খেতে ভালোবাসত কিনা... আর দোহাই দিত নিয়মের।’’ চোখের পাতায় ভেসে ওঠে রমা দেবীর কাটানো মুহূর্তগুলো। এপাশ থেকে রাইমা বলে ওঠে, ‘‘ওহ্! মা এতো কেন চিন্তা করো বলো তো? আমি কি কোনোদিন ভুলেছি বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে এই দিনটার কথা? আমাদের চলতে যত কষ্ট হোক না কেন, এই দিনে তো তুমি আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের সব ঘরে ঘরে গিয়ে পিঠে, পুলি, পায়েস, দিয়ে আস। আমি আনব নিশ্চিন্তে থাক। মা, রাখো রাখো ট্রেন এসে গেছে, বলে ফোনটা ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়েই ট্রেনে উঠে পড়ে রাইমা, অসাবধানতায় ব্যাগের চেনটা আটকাতে ভুলে যায়।

ট্রেন থামে পার্কসার্কাসে বেশ অনেকক্ষণ। ওরা দু’জনে কথা বলছে। পাশেই এক জীর্ণ, শীর্ণকায়, পরনে ময়লা শাড়ি পরা এক মহিলা ও তার ছেলেকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শিয়ালদহ ঢুকতেই রাইমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে নেমে ছুটে চলে যায় সেই মহিলা।

- সৃজা রাইমাকে ধরে বলে, ‘‘ঠিক আছিস্ তো? কি অদ্ভুত!’’

- ‘হ্যাঁ, ... এ কি? এ কি আমার ব্যাগের চেন খোলা? আর আমার পয়সার ব্যাগ কোনো কিছুই তো নেই!’’ ব্যাগের দিকে তাকিয়ে চেনটা খোলা দেখে অস্থিরভাবে পুরো ব্যাগটা খুঁজতে খুঁজতে বলে রাইমা।

সৃজা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, রাইমা চুপ করে বসে, বেশ কিছুক্ষণ বাদে রাইমা আর সৃজা দু'জন মিলে একটা জি.ডি. করিয়ে কলেজে পৌঁছায় দুপুর ১টা ৩০ নাগাদ।

- ''সৃজা আমাকে তোর ফোনটা একটু দিবি রে?''

- ''হ্যাঁ অবশ্যই, এটা আবার জিজ্ঞেস করতে হয়?''

রাইমা তার মাকে ফোন করে সবটা বলে। তার মা চিন্তায় ভেঙে পড়েছে দেখে সে বলে, ''মা চিন্তা কোরো না, একটা কম দামী ফোন ঠিকই কিনে নিতে পারব ই.এম.আই.তে। আর রইল বাকি সংক্রান্তির কথা। এবার না হয় একটু ছোটো আয়োজনেই সবটা হবে।'' রমা দেবী মেয়ের কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হন।

''বাবু, এই দেখ আজ ওই ফোনটা আনতে পেরেছি ট্রেন থেকে। আজকে তো আমাকে কিন্তু টাকা দেবে? ... তিন দিন একটা ফোনও আনতে পারিনি, পেটে একটাও দানা পড়েনি। আমরা মা-ব্যাটাতে পেটে গামছা বেঁধে শুয়ে ছিলুম। আজ একটু কিছু দিও বাবু। ... ও বাবু। বড্ড খিদে লেগেছে আমার। ছেলেটার একটু কিছু পয়সা দিও গো আজ...''

(ভাসা ভাসা চোখে বলে ওঠে জীর্ণকায় সেই মা)

বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থান

মল্লিকা নস্কর, তৃতীয় সেমেস্টার

সৃষ্টির আদি থেকেই সৃষ্টিকর্তা পরস্পর সমান্তরাল দুটি জাতির সৃষ্টি করেন। তিনি সযত্নে এই দুই জাতিকে সমান দায়িত্ব, কর্তব্য অর্পণ করেছেন। কিন্তু স্রষ্টা সমানাধিকার বা সাম্য পৃথিবীর বুকে দেননি। যেহেতু সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত নয়, তাই দেখা যায় যে নারী ও পুরুষের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। দায়িত্ব, কর্তব্য সমানভাবে বন্টিত হলেও বহুক্ষেত্রে, অনেক সময়ই নারীকে লাঞ্ছিত হতে হয় পুরুষের সৃষ্ট কারণে। অতএব, যখন পুরুষ সংসারে একাধিপত্য স্থাপন করে নারীর ন্যূনতম বেঁচে থাকার বা জীবন ধারণের অধিকারকে খর্ব করে দিতে চায় তখন স্বভাবতই স্বাভাবিক নিয়মেই নারী-পুরুষের দ্বন্দ্বের অবতারণা হয়। এই মতানৈক্যই অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত চলে আসছে। তবে একথা সত্য যে যতদিন পুরুষ নারীজাতিকে সমান সম্মান ও অধিকার দিতে অস্বীকার করবে ততদিন এই আলোচনার শেষ হবে বলে মনে হয় না।

আলোচনার শুরুতেই একটা বিষয় বলে নেওয়া আবশ্যক, সেটা হল এই যে, সমাজের গুরুদায়িত্ব পুরুষ জাতির স্কন্ধে অর্পিত থাকে বলে অনেক ক্ষেত্রে নারী স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে সসম্মানে সংসারে আপন স্থান আলোকিত করতে পারে। তথাপি অতীতকালের মত বর্তমান সময়েও কিছু ব্যতিক্রমী চরিত্র আছে যাদের লালসায় হিংস্র বন্য পশু ভর করে। ফলে, অত্যন্ত পাশবিক, নীচ, ঘৃণ্য কাজও কিছু কিছু সমাজে নিরন্তর সারা বিশ্বজুড়ে ঘটে চলেছে। প্রসঙ্গানুসারে বলা যায়, সমগ্র শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মাতৃজাতির এই বিদ্রোহী মনোভাব কেবলমাত্র অন্তরে পাশবিক ভাব পোষণ করা মনুষ্যের ন্যায় বাহ্যিক দর্শন কতকগুলি প্রাণীর বিরুদ্ধে, বলা ভালো এই পাশবিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে।

পুরাণ বা মহাকাব্যেরর যুগ থেকে আমরা দেখি আসুরিক বলপ্রাপ্ত, মতিভ্রষ্ট, লোলুপ পুরুষ নারীকে ভোগ্য পণ্য হিসাবে বিচার করে তথাকথিত সভ্যসমাজের অতিবিকৃতরূপ মাতৃজাতির সম্মুখে প্রদর্শিত করেছে। পুরাণ, মহাকাব্যগ্রন্থাদি তথা বাস্তব জগতে পুরুষের সেই শৃগালের ন্যায় চক্ষু আজও প্রদর্শমান। এ প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের লেখা পাপ কবিতায় দেখা যায় —

> ‘‘প্রহরী সেখানে চোখা চোখ নিয়ে সুন্দর শয়তান,
> বুকে বুকে সেথা বাঁকা ফুল-ধনু, চোখে চোখে ফুল-বান!’’

আজকের দিনে কবিতাটির লাইন কয়টি যে কতখানি সত্য তা বর্তমান সামাজিক অবস্থার দিকে তাকালে বোঝা যায়। মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রটির উপর খানিক দৃষ্টিপাত করলে নারীর অবস্থান বেশ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। রাজকন্যা, রাজপুত্রবধূ তথা আর্যাবর্তের একটি রাজ্যের সম্রাজ্ঞী

হওয়া সত্ত্বেও সর্বোপরি পাঁচজন সমর্থ পতি বর্তমান থাকতেও তাঁকে ভরা রাজসভায় তথাকথিত সভ্য, রাজসভাসদগণ এবং আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ সামর্থসম্পন্ন বীর-যোদ্ধাদের সম্মুখেই সাংঘাতিক কুরুচিকর বাক্যবান এবং যথেষ্ট অপমানজনক ঘটনা সহ্য করতে হয়। এছাড়াও ক্ষত্রিয় নিধনকারী পরশুরামের মাতৃহননের কথাও শাস্ত্রে কথিত আছে। এই প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের নারী কবিতার একটি উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য -

''তিনি নর-অবতার -

পিতার আদেশে জননীরে যিনি কাটেন হানি কুঠার''

সুতরাং, পিত্রাদেশে মাতৃহন্তা ব্যক্তিই মনুষ্য বিচারে অবতার। অতএব, পুরুষশাসিত সমাজ তাদের ভাবনার প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে, প্রতিটি স্তরে স্তরে পুরুষ কর্তৃক নারীর অসম্মান গেঁথে রেখেছে। হাজার হাজার বছর পরও মনুষ্যস্মৃতি থেকে এই বিশ্বাস এতটুকু শিথিল হয়নি বরং আরও বদ্ধমূল হয়ে জগদ্দল প্রস্তর সদৃশ্য কন্ঠরোধ করে বসেছে। এক্ষেত্রে শাস্ত্রবর্ণিত গার্গী মৈত্রীর শাস্ত্রজ্ঞান এবং সে সময় তাঁদের বিরোধী পুরুষ সমাজকে আমরা দেখতে পাই। পুরাণের রূপকথার যক্ষপুরী পরিত্যাগ করে বাস্তবের মাটিতে পা রেখে ইতিহাস দর্শন করলে রাণী রাসমণি, চন্দ্রমুখী বসু, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী প্রমুখ মহীয়সী, বিদুষী নারীর কথা জানতে পারি। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে নিজেদের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করা এই সমস্ত মহিলারা নিজ অথবা পুরুষের প্রয়োজনে এমন অনেক কাজই করেছেন যাতে তাঁদের নানান রকমভাবে বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সেই সময়ের অন্তপুরবাসিনী রমণীগণের পর্দা উন্মোচিত বহির্জগতে পদার্পণ তথাকথিত ক্ষমতাশালী পুরুষজাতির অন্তর্গত কিছু ব্যক্তি মেনে নিতে পারেন নি। তবে একথাও ততোধিক সত্য যে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর মত অকথিত আরও অনেক সৎমনোভাবাপন্ন ব্যক্তি সেই প্রথম সারির মহিলাদেরকে রন্ধনশালা থেকে পাঠশালায় পৌঁছতে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। বিশেষত রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা রদ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ এবং নারী শিক্ষার প্রসার না ঘটালে আজও হয়ত বাংলার কোনো গ্রামাঞ্চলে মৃত স্বামীর সঙ্গে এক চিতালনে সদ্য বিধবা কন্যাকে আহুতি দেওয়া হত সমাজের কল্যাণযজ্ঞে।

পুরুষের সঙ্গে সম্মুখ সমরে সমান তালে দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাতঙ্গিনী হাজরার মত সাহসী বীরাঙ্গনাদের আমরা দেখতে পাই। তবে কেবল শক্তি ও সাহসিকতার নিরিখেই যদি নারী-পুরুষের সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার নির্ণয় করা হয় তবে বলতে হয় যে মনুষ্যজাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ একথা খানিক ভুল। কারণ, অন্য অনেক প্রাণীর জীবন ধারণের মাপকাঠি এটিই। বলা বাহুল্য, তথাপি রাণী লক্ষ্মীবাঈও তাঁর পুরুষ সৈনিকদের সঙ্গে সমানতালে যুদ্ধ করে তাঁর প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন মাতৃভূমি রক্ষার্থে। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'যে জাতি মাতৃজাতিকে সম্মান করতে পারে না, সেই জাতির উন্নতি কিছুতেই হতে পারে না।'

সমাজে নারীর বাস্তব অবস্থান ঃ

সৃষ্টির ভালো-মন্দ সমস্ত কাজেরই স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই সমান সমান দায়িত্বভার নিজ স্কন্ধে বহন করে। তাই যে কোনো একজনের অনুপস্থিতি সংসারে অসম্ভব এবং তা সৃষ্টির চিরচঞ্চলগতিকে রুদ্ধ করে তুলবে। কাজী নজরুল ইসলামের মতে —

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।"

কালের গতিকে সচল রাখতে নারী-পুরুষ সর্বদা সমান্তরালভাবে ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ইতিহাসখ্যাত হিটলার মাতৃজাতির উদ্দেশ্যে বলেছেন Go back to kitchen। কেবলমাত্র রান্নাঘরে আটকে রাখার যুক্তিকে বিশ্বের অনেক মহীয়সী, বিদুষী রমণীই ভুল প্রমাণ করেছেন। কল্পনা চাওলা, মাদার টেরেসা, সরোজিনী নাইডু নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁদের রন্ধনশালার বাইরের দক্ষতা বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করেছেন। মাতৃজাতির প্রতি শরদিন্দু কর্মকার তাঁর নারী কবিতায় বলেছেন যে -

"বাপের ঘরের লক্ষ্মী আমি
স্বামীর ঘরের অন্নপূর্ণা।
ছেলের ঘরের জননী আমি
আমি ছাড়া সংসার অসম্পূর্ণা।।"

তবে নারী লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা আর জননীরূপে বিরাজিতা হলেও সংসারে তার অবস্থার কথা জানা যায় নকুল বিশ্বাস-এর লেখা এই গানটি থেকে।

"বাপের বাড়ী এই গাঁয়ে,
শ্বশুড় বাড়ি ঐ।
তোমার বাড়ি কই গো নারী?
তোমার বাড়ি কই?"

গানটি কিছু বাস্তব এবং কঠিন সত্যের মুখোমুখী দাঁড় করায় মানব জাতিকে। বাপের বাড়ি এবং শ্বশুর বাড়িতে লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা বলে অভিহিত করা হলেও সেই লক্ষ্মীরাই অবলা কারণ তাদের বাক্ স্বাধীনতা বা যে কোনো ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ স্বীকার করে না। ইতিহাস থেকেও আমরা দেখতে পাই যে, মাতৃজাতিকে কোনো সম্পত্তির অধিকারিণী হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার পাশাপাশি তাদেরকে স্বয়ং পুরুষের সম্পত্তি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। মহিলাদের নিজে স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকারকে নস্যাৎ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা মানসী কবিতাটি দ্রষ্টব্য —

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারী।।"

সমাজে পিতৃতান্ত্রিকতা এমনই বদ্ধমূলভাবে পরতে পরতে স্থাপিত হয়েছে যে তার ফলস্বরূপ পুরুষকে নারীর দ্বিতীয় বিধাতারূপে প্রতিষ্ঠিত করাই যায় এই মনোভাব সবার মধ্যে গেঁথে আছে।

বর্তমান আধুনিক যুগে কন্যা সন্তান, গৃহবধূ, বৃদ্ধা মহিলার উপর বলপ্রয়োগের ঘটনা সংবাদমাধ্যমে প্রায়ই চোখে পড়ে। বর্তমান যুগে আধুনিকতার আলোকে আলোকিত সমাজে নারীর অবস্থান যে কতখানি দুর্বিষহ তার প্রমাণ পাওয়া যায় একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে কলকাতা শহরের নামী হাসপাতালে কর্মরতা মহিলা চিকিৎসকের মর্মান্তিক মৃত্যু। এই সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার পর বিদ্রোহী কবির ভাষায় প্রশ্ন জাগে -

"মুক্ত কি আজ বন্দিনী বাণী?
ধ্বংস হল কি রক্ষপুর?
যক্ষপুরীর রৌপ্য পঙ্কে
ফুটিল কি তবে রূপ-কমল?"

সত্যই আজও নারীজাতি যক্ষপুরীর বন্দিনী। তবে নারীজাতির উপর অবজ্ঞার শরনিক্ষেপণের প্রাক্‌মুহূর্তে একথা অবশ্যই বিচার্য যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে টিকিয়ে রাখতে মাতৃজাতিই ভবিষ্যৎ পুরুষ জাতির জন্মদান এবং লালন-পালন করে। হিন্দু শাস্ত্র মতে আমরা দেখি যে, দেবতারা বারংবার বিপদের সম্মুখে এসে উপনীত হলে শক্তিহীনা অবলাকেই কালী, দুর্গা বিভিন্নরূপে তাঁদের বিপদ দূরীকরণ করতে হয়।

কেবল পুরুষই নয়, নারীর অবনতি বা উন্নতির পথে বাধা হিসাবে অনেক নারী থাকেন সর্বাগ্রে। তাই নিজেদের তথা সংসারে কল্যাণের কথা চিন্তা করে কুসংস্কার এবং হীনমন্যতা দূর করে নিজেদের চিন্তাভাবনার পরিধি বর্ধিত করা নারীজাতির আশু কর্তব্য। যেমন বীজ ব্যতিরেকে বৃক্ষ বিকশিত হতে পারে না, ঠিক তেমনই নারী-পুরুষ উভয়ই সমানভাবে অপরিহার্য সৃষ্টিকার্য পরিচালনার জন্য। আবারও নজরুল ইসলামের নারী কবিতার সূত্র অনুসরণ করে বলা যায় —

"নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুধা, সুধায় ক্ষুধায় মিলে
জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে!"

শেষে বলা যায় যে, কোনো কোনো পরিবেশে নারীর প্রাপ্ত স্বাধীনতা যাতে উচ্ছৃঙ্খলতার পর্যায়ে পর্যবসিত না হয় সে দিকে তার সতর্ক দৃষ্টি রাখা অবশ্যই জরুরী।

বাংলা গোয়েন্দা গল্পের ধারা ঃ ইতিহাস ও বিবর্তন

অধ্যাপিকা শুক্লা পাঠক

এদেশে গোয়েন্দা গল্প প্রথম কোথায় পাওয়া যায় — তা নিয়ে নানা মহলে নানা কথা উত্থাপন হয়েছে। গোয়েন্দা পরাশরের সৃষ্টিকর্তা প্রথিতযশা সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র তো খোদ মহাভারতের মধ্যেই গোয়েন্দা গল্পের উপকরণ অর্থাৎ রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন বিরাট পর্বে। বিরাট রাজার রাজধানীতে একজন সামান্য পাচক সবাইকে মল্লযুদ্ধে কুপোকাৎ করছে, মাঝরাত্তিরে প্রধান সেনাপতির চটকানো মৃতদেহ পাওয়া গেল নাচঘরে — রাজ্যে সন্দেহজনক কয়েকজন ঘোরাফেরা করছে — এমন সব রহস্য সূত্র তো স্বয়ং বেদব্যাসই দিয়েছেন, কিন্তু তিনি সেদিকে দৃষ্টি দেন নি, বা বলা ভালো এগুলিকে উপেক্ষা করেছিলেন। অনেক কাল পরে, একেবারে আধুনিক কালে লেখা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রত্নদীপ' উপন্যাসে ঠিক এইরকম মালমশলা ছিল। মৃত ব্যক্তির ছদ্মবেশে তার double সেজে জমিদারি ভোগ করতে যাওয়ার গল্পে গোয়েন্দা আসতেই পারত, কিন্তু লেখক সেদিকে যাননি।

বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ বহুধরনের গল্প লিখলেও ঠিক সে অর্থে কোন গোয়েন্দা গল্প লেখেন নি, যদিও তাঁর একটি গল্পের নামই 'ডিটেকটিভ'। তবে সে গল্পে গোয়েন্দার প্রশংসা নয়, বরং তাকে নিয়ে তিনি পরিহাসই করেছেন। তবে তিনি যে ডিটেকটিভ গল্প লিখতে পারতেন তার প্রমাণ আছে 'গুপ্তধন' গল্পে। 'অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি' দিয়ে শুরু করে রাত ভোর পূজা, গুপ্তধনের নক্সা, শরিকি ঈর্ষার গোপনীয়তা — ইত্যাদি গোয়েন্দা গল্পের উপযুক্ত সব উপকরণই এতে ছিল, ছিল গুপ্তধনের সংকেত চিহ্ন। ছিল একটি ধাঁধা। কিন্তু তাঁর মানসপ্রবণতা এর সপক্ষে ছিল না।

বিদেশে ক্রাইম স্টোরি (crime story)-র প্রথম ছক দিয়েছিলেন অ্যাগডার আল্যান পো। আসলে রহস্যের প্রতি পো-র একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তাই একদিকে যেমন অতিপ্রাকৃত রহস্য সৃষ্টি করেছেন গল্পে, তেমনি গোয়েন্দা গল্পের রহস্যও। তাঁর গোয়েন্দা দুঁপ্যা। সেখান থেকেই বলা যায় গোয়েন্দা গল্পের যাত্রা শুরু। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় গোয়েন্দা শার্লক হোম্‌সকে স্যার আর্থার কোনাল ডয়েল আনেন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে।

বাংলা গোয়েন্দা গল্পেরও যাত্রা শুরু প্রায় ঐ একই সময়ে। ১৮৯২ সালে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় লিখতে লাগলেন 'দারোগার দপ্তর'। তিনি সরকারী গোয়েন্দা দপ্তরে কাজ করতেন। এই সিরিজের

২০৬টি বই বেরোলো। প্রথম বই 'বনমালী দাসের হত্যা'। প্রিয়নাথ অবশ্য সাহিত্যিক ছিলেন না। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী লিখেছিলেন।

এই সময়েই কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'বরকতউল্লা দারোগার গল্প'। এঁর অসামান্য বুদ্ধির জন্য ইনি লোকমুখে হয়ে যান 'রকউল্লা' পরে 'বাঁকাউল্লা'। ঠগী কমিশনের রিপোর্ট থেকে 'বাঁকাউল্লার দপ্তর' উপস্থাপন করেন কালীপ্রসন্ন।

'ভারতী' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারীদেবীর অনুপ্রেরণায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১২৯৪-এর বৈশাখ সংখ্যায় লিখলেন 'চুরি না বাহাদুরী'। ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণেতা হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ও এই 'ভারতী'তেই লিখলেন 'হত্যাকারী কে?' রবার্ট ব্লেক ও স্মিথকে নিয়ে বিখ্যাত দীনেন্দ্রকুমার রায়েরও হাতে খড়ি 'ভারতী' পত্রিকা। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের পরে শরৎচন্দ্র সরকার ১৩০১ সালে 'গোয়েন্দা কাহিনী' নামে একটি সিরিজ বের করেন। তিনি ছাড়া আরো কয়েকজন এতে লিখতেন। বছর চারেক চলেছিল এই সিরিজ। নীরদবরণ দাস ১৩০০ সালের পরে 'ডিটেকটিভের গল্প' নামে আর একটি সিরিজ বের করেন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কল্পনার রং মিশিয়ে চমকে দিলেন পাঁচকড়ি দে। তিনি অবশ্য ঠিক মৌলিক গল্প লিখতেন না, বিদেশী কাহিনীকে দেশী পোষাক পরাতেন। তিনি এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিলেন যে, তাঁর অনেক দিন পরে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ব্যোমকেশ কাহিনী লিখছেন, তখন ব্যোমকেশকে দিয়ে পাঁচকড়ি দে-র নাম করাচ্ছেন। তাঁর একটি গল্পে সহকারী অজিত যখন জিজ্ঞাসা করল ''হত্যাকারী কে?' তখন 'ব্যোমকেশ বলিল, পাঁচকড়ি দে।''

বাংলা সাহিত্যের মূলস্রোতে গোয়েন্দা গল্পকে নিয়ে আসার কৃতিত্ব একদিকে স্বর্ণকুমারীদেবীর, অন্যদিকে 'কুন্তলীন পুরস্কার' প্রবর্তক হেমেন্দ্রমোহন বসুর। এই পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পগুলিকে নিয়ে সংকলন বেরোতো, তার মধ্যে গোয়েন্দা গল্পও থাকত। দীনেন্দ্রকুমার রায় 'রহস্য লহরী' সিরিজে ২১৭টি ডিটেকটিভ গল্প লিখেছিলেন। তিনি বিদেশী গল্পের অনুবাদ করে যেতেন, তবে নাম বদলে দিতেন। গল্পগুলো জনপ্রিয় হয়েছিল। এইসব কাহিনী যুগের চাহিদা মিটিয়েছিল। কত অন্ধকার পরিবেশ, প্রতারণা এবং তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ — ইত্যাদি পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছিলেন এঁরা। কোন খুন গোয়েন্দার এক্তিয়ারভুক্ত নয়, আর কোনগুলো গোয়েন্দা তদন্ত করবে, সে সব এই কাহিনীগুলোতেই পাঠক বুঝে নিতে পেরেছিল। এইসব 'সিরিজ সাহিত্যে'র বৈশিষ্ট্য হল, এখানে গোয়েন্দা বা গরিবের বন্ধু যিনি, তিনি উৎপীড়িতদের জন্য বিপদে ঝাঁপ দিতেন। পাঠক এগুলোর মধ্যে যেমন বিপজ্জনক অ্যাডভেঞ্চার পেত, তেমনি পেত সামাজিক বিপ্লবের ইসারা। এইসব গল্পগুলোয় ঘটনার মধ্যে চরিত্র-প্রাধান্য থাকতো। ইংরাজী সাহিত্যে যারা 'famous five' (ফেমাস

ফাইভ), তারাই বাংলায় ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'পঞ্চপাণ্ডব' হয়ে এসেছে। এইসব গোয়েন্দারা বুদ্ধিবিবেচনায় বিশিষ্ট হয়, তাদের সহকারীরা সেদিক থেকে অনেক দুর্বল। এরা পারে না, আর গোয়েন্দা পারে, আমাদের নিজস্ব জীবনের দুর্বলতার পটভূমিতে এইসব গল্প আমাদের ইচ্ছাপূরণের সুযোগ দেয়। এইসব গোয়েন্দারা সাধারণভাবে থাকে, চলাফেরা করে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তারা রবিন হুড হয়ে দেখা দেয়।

'সিরিজ সাহিত্য'-গুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, জীবনের দুঃশাসন দূর করার জন্য আকারে-প্রকারে এরা জীবনের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে — 'larger than life'. এই সিরিজ সাহিত্যে সাধারণের ইচ্ছাপূরণের প্রথম বড়ো মাপের উদাহরণ শশধর দত্তের 'মোহন' সিরিজ। যা মানুষ নিজে করতে চায়, করতে পারে না, সেই লড়াই তার হয়ে মোহন করে চলেছে এই সিরিজের ২০৬টি গ্রন্থের মধ্যে । অসম্ভব বিক্রি ছিল মোহন সিরিজের। এইসব বইয়ের আবির্ভাব ঘটেছিল প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর অস্থিরতার সময়ে। এদের সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ বইগুলোর সাহিত্যগুণের মধ্যে ছিল না, ছিল সেই অনিশ্চিত অন্ধকার দিশাহারা সময়ের মধ্যে।

মোহনের জনপ্রিয়তার দিকে তাকিয়ে দেবসাহিত্য কুটিরও এইরকম সিরিজ প্রস্তুত করতে থাকে। ১৯৪৮ সালেই 'শুকতারা' প্রকাশনীর 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'প্রহেলিকা' সিরিজ বেরোলো। দুটিতে লিখেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সুনির্মল বসু - প্রমুখেরা। এই সিরিজের অনুকরণে 'শরৎ সাহিত্য ভবন' বের করেছিল 'অলকানন্দা' সিরিজ। সেখানেও প্রথম বই লেখেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র গোয়েন্দা কাহিনী লিখেছেন 'মিস্‌মিদের কবচ'। লেখাটির মধ্যে অলৌকিকতাও আছে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ লিখেছেন 'উদাসীবাবার আখড়া'। নাম শুনেই বোঝা যায় একজন সাধুবাবার গল্প হবে, এবং তাতে সেই বাবার শঠতা, প্রতারণা দেখা যাবে। নীহাররঞ্জন রায়ের জনপ্রিয় গোয়েন্দা কিরীটি রায়। সে স্যুট পরে, পাইপ খায়, টু-সিটার গাড়ি চড়ে। অত্যন্ত জনপ্রিয় সে। এদের সাফল্য দেখে বড়োদের জন্য বেরোলো 'পিরামিড সিরিজ'। ছোটদের ছাড়িয়ে যুবক-যুবতীদের জন্য। এখানে প্রচলিত নারীভাবনাকে ভেঙে দেওয়া হয়। স্বপনকুমার এই সিরিজ সাহিত্যের জনপ্রিয় নাম। কয়েক'শ বই লিখেছেন তিনি। 'বাজপাখী', 'কালরুদ্র', 'ড্রাগন' সিরিজ জুড়ে তাঁর বই। তাঁর ড্রাগন সিরিজের সব ক'টি বইয়ের নামকরণে আছে 'ড্রাগন' শব্দটি। তাঁর গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী। গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী সব পারে। দু'হাতে গুলি চালাতে পারে, পাইপ বেয়ে উঠতে পারে, কার্নিসে চড়তে পারে, চলন্ত গাড়িতে অ্যাকশন করতে পারে। কিন্তু ধীরে ধীরে এসব গোয়েন্দার আকর্ষণ ম্লান হয়ে গেছে। পাঠক পরিণত হচ্ছে, গোয়েন্দাও পরিশীলিত হচ্ছে।

এই পরিশীলিত গোয়েন্দা গল্পের অন্যতম পথিকৃৎ হেমেন্দ্রকুমার রায়। তিনি বড়োদের জন্যই লিখতেন। ১৯২৩-এ তিনি লিখলেন 'যখের ধন'। এ কাহিনী আপামর বাঙালীর মন জয় করে নিল, বিশেষত কিশোর পাঠককুলের। সেই কিশোরেরা প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ হয়েও গোয়েন্দা জয়ন্ত-মানিক জুটিকে ভোলেনি। তাঁর গল্পে বিদেশী ছাপ কোথাও কোথাও পড়েছে, কিন্তু তাঁর বিন্যাসটি ছিল মৌলিক বাঙালিয়ানায় পুষ্ট। বিমল-কুমার ছিল হেমেন্দ্রকুমারের অ্যাডভেঞ্চার চরিত্র। তারাও কখনো কখনো গোয়েন্দাগিরি করেছে। একটি গল্পে জয়ন্ত-মানিক-বিমল-কুমার একসঙ্গে কাজ করেছে।

১৯৫৬তে প্রেমেন্দ্র মিত্র আনলেন গোয়েন্দা পরাশরকে। সফল গোয়ন্দা হলেও, নিজেকে সে 'কবি' বলতেই ভালোবাসে। তার কবিতা বন্ধু-সম্পাদকও ছাপাতে চায় না, তবু সে থামছে না। পরাশর গোয়েন্দা ছিল এ যাবৎ পরিচিত সমস্ত গোয়েন্দা ছকের বাইরে। খুব বুদ্ধি, নজরও তীক্ষ্ণ। আলাপে-সংলাপে-আচরণে সে সম্পূর্ণ আলাদা। লেখকের ভাষায় রহস্যময়তার মুন্সিয়ানা, ঘটনাকে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলার নৈপুণ্য, কাহিনীকে এগোনো-পিছোনোর কৌশল — এসব বুদ্ধিমান পাঠক উপভোগ করবেন। যখন গল্পটা যেমন-তেমন করে চলছে, তখন হঠাৎ তার সব কিছু বদলে যায়। পরিবর্তিত হয় পটভূমি, চরিত্র, ডিটেকশান পদ্ধতি। এমনটি বাংলা গোয়েন্দা গল্পে আগে আসেনি। পরাশরের বুদ্ধিমান, ছকভাঙা পদক্ষেপ, কৌতুকে মোড়া আল্‌গোছে ছুঁড়ে দেওয়া ঝকঝকে মন্তব্য — সব কিছু নিয়ে এই কাহিনীগুলো এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

বাংলা গোয়েন্দাগল্প কতটা প্রাপ্তমনস্ক ও পরিণত হয়েছে — এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত জানিয়েছেন, তাঁর এক বন্ধুর কথা, যিনি বলেছিলেন — ''রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসে রাজসিংহের যে স্থান নির্দেশ করেছিলেন, বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ সেই স্থান অধিকার করতে পারে।'' — অনেকের কাছে এ মন্তব্য অতিরঞ্জিত বলে মনে হলেও এর সারবত্তাকে অস্বীকার করতে পারবেন না কেউই।

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর এক বিস্ময়কর প্রতিভা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকার ১৩৩৯ সালে 'পথের কাঁটা' দিয়ে তাঁর আবির্ভাব। ব্যোমকেশ প্রথম গল্প থেকেই উপস্থিত। তারপরেই প্রকাশিত হতে থাকে একের পর এক রোমাঞ্চকর ও চিত্তাকর্ষক গল্প — 'সত্যান্বেষী', অর্থমনর্থম্', 'অগ্নিবান' ইত্যাদি। আগে খুন-খারাপি, হরর্, রোমাঞ্চকর কাহিনী ও সন্ত্রাসই ছিল প্রধান। এবার গোয়েন্দা কাহিনীর জাত পাল্টে গেল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং বুদ্ধির খেলাই প্রাধান্য পেল। তবে খ্যাতির শীর্ষে উঠে শরদিন্দু গোয়েন্দা কাহিনী লেখা প্রায় বন্ধ করে দিলেন। এই ঘটনার সঙ্গে অনেকটা মিল আছে স্যার আর্থার কোনাল ডয়েলের শার্লক হোম্‌সের গল্পের। 'Final Problem' গল্পে কার্যত প্রায় হোম্‌সের মৃত্যুই দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু প্রবল পাঠক বিক্ষোভে

বেশ কিছুদিন পরে হোমস্‌কে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন তিনি। শরদিন্দুও দীর্ঘদিন পরে অনেকটা পাঠকের দাবিতে বাধ্য হয়েই ব্যোমকেশকে ফিরিয়ে আনেন এবং এনেই অভাবিত চমক — 'চিড়িয়াখানা।' এই গল্প নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ হল এবং ব্যোমকেশের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘটল সত্যজিৎ রায়ের হাতে। ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে এর প্রায় সমসাময়িক কালেই (১৯৬৫-৬৬) স্বয়ং সত্যজিৎই আসরে নেমে গেছেন ব্যোমকেশের একপ্রকার প্রতিদ্বন্দ্বী গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্তিরকে সঙ্গে নিয়ে!!

শরদিন্দুর গোয়েন্দা কাহিনীর জগতে ফিরে আসাকে হোম্‌সের ভাষায় বলা যায় 'ব্যোমকেশ বক্সীর প্রত্যাবর্তন'। প্রত্যাবর্তনের পর যে সমস্যাগুলির তিনি সমাধান করলেন তার প্রত্যেকটিই classic পর্যাভয়ভুক্ত - 'চিড়িয়াখানা', 'অচিন পাখি', 'দুর্গরহস্য', 'চিত্রচোর'। ব্যোমকেশই নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা এবং স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ও একথা স্বীকার করেছেন। তাকে আন্তর্জাতিক গুণমানের অধিকারী বলতে দ্বিধা নেই। হোম্‌সের বুদ্ধি, পোয়ারোর মেথড, — এর পাশাপাশিই ব্যোমকেশের 'চিন্তক' পরিচয় অনায়াসে খাপ খেয়ে যায়। ব্যোমকেশ শুধু বুদ্ধিমান বলে পাঠকের মনোহরণ করেছে তা নয়, সে সহৃদয় বলেও সকলের হৃদয়হরণ করেছিল। তুচ্ছ বস্তু থেকে কেবল অপরাধী নির্ণয়ই নয়, সামাজিক সমস্যার জটও সে খুলে দেয়।

এরপর সত্যসত্যই যখন ব্যোমকেশ অবসর নেওয়ার মুখে, অ্যাডভেঞ্চার, বিশেষ করে ছোটদের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী হেমেন্দ্রকুমার রায়ের পর যখন শেষ হয়ে যাচ্ছিল, জনপ্রিয় গোয়েন্দা কাহিনীর অন্তিম পর্ব চলছিল নীহাররঞ্জন গুপ্তের মত সামান্য কয়েকজনের কলমে - ঠিকই তখনই সম্পূর্ণ মধ্যবিত্ত ভাবনা আর বিশ্বাসের জগৎ থেকে আবির্ভূত হলেন সত্যজিৎ রায়ের নায়কোচিত গোয়েন্দা 'ফেলুদা'। প্রথম গল্প 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'। শুরু হয় 'সন্দেশ পত্রিকায় ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায়। ধারাবাহিক ৩ কিস্তিতে শেষ। তখন ফেলুদার শখের গোয়েন্দাগিরি। এরপর এল ঐ সন্দেশেরই পাতায় ধারাবাহিক গোয়েন্দা উপন্যাস 'বাদশাহী আংটি' ১৯৬৬-৬৭। ফেলুদা এখান থেকে গোয়েন্দাগিরিতে সিরিয়াস। ১৯৬৭তে 'কৈলাস চৌধুরীর পাথর।' ভিজিটিং কার্ড ছাপালো ফেলুদা — 'Prodosh Ch. Mitter, Private Investigator'। গোয়েন্দা গল্পর ধারা, গোয়েন্দা গল্প সম্পর্কে আমাদের ধারণা, গোয়েন্দা গল্পের সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের বোধ — সব পাল্টে দিল ঐ একটি গল্প — 'বাদশাহী আংটি'। সব বয়সি পাঠক, বিশেষত কিশোর-কিশোরীরা এমন পছন্দ করে ফেলল যে তারপর ক্রমান্বয়ে ফেলুদার গল্প লিখে যাবেন — এই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া সত্যজিতের আর কোন উপায় রইল না।

সত্যজিৎ রায় এবং প্রদোষচন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদার জনপ্রিয়তার প্রথম এবং প্রধান কারণ হল তাঁর গোয়েন্দা কাহিনী একেবারে অন্যান্য সাধারণ গল্পের মত, আর গোয়েন্দা চরিত্রও আচার-আচরণে খাঁটি বাঙালি। পরিষ্কার বাঙালিভাবে সে বাঁচতে ভালোবাসে, বাঙালি খাবার ভালোবাসে, অথচ দৃঢ়তা, সময়নিষ্ঠা, অধ্যাবসায়, শারীরিক সক্ষমতা অসাধারণ। সবচেয়ে বড়ো তার বুদ্ধি, যেটাকে সে নিজে বলে 'মগজাস্ত্র'। অথচ তাই বলে যে ব্যোমকেশের মত কেবল ধী-শক্তিকেই প্রয়োগ করে না, শরীরটাকেও সে তৈরি করেছে চাবুকের মত, এবং সেটাকে সে প্রয়োজন মতো ব্যবহারও করে। তাঁর স্রষ্টা সত্যজিতের মতই তার সব ব্যাপারে অদম্য কৌতুহল; দেশ ভ্রমণে অসীম উৎসাহ - কারণ দেশটাকে সে খুঁটিয়ে চিনতে চায়; সে কোথাও ভুল করলে স্বচ্ছ মনে তা স্বীকার করে। এই সঙ্গে আছে নিপাট ঘরের ছেলে তোপ্‌সে এবং 'সোনার কেল্লা' গল্প থেকে তার সহকারী এবং অসাধারণ কমিক চরিত্র রহস্য-রোমাঞ্চ গোয়েন্দা গল্পের লেখক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু।

পরিশেষে বলতে হয়, গোয়েন্দা কাহিনী কেবল সময় কাটাবার জন্য বিনোদনের উপায় - এ কথা আজ সত্য নয়। এতে সামাজিক উপকরণ, মানবিক উপাদান - এক কথায় জীবনের সমস্ত ওঠা-পড়াই প্রতিফলিত হয়। বাংলা গোয়েন্দা গল্পের এক'শ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে বেশ কিছুকাল আগেই। এই দীর্ঘকালে শুধু জীবনযাপনই বদলায় নি, জীবন দর্শনও বদলেছে। গোয়েন্দার জীবন এবং জীবনেরও গোয়েন্দা হয়ে উঠেছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''রোমাঞ্চ কাহিনীও সাহিত্যই। এখানেও নানাবিধ মনুষ্য চরিত্র উদঘাটিত হয়। শুধু রহস্য আছে বলেই একে উপেক্ষা করা যায় না। 'অনেক নোবেল প্রাপকও এই জাতের গল্প লিখেছেন।''

হাস্যভ্রমণে টাকী

শুভশ্রী সরকার

তিন বছরের কোটা শেষ হতে মাসখানেক বাকি, হঠাৎ করেই মাথায় চাপল, ঘুরে আসবো টাকী। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। কলেজের শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলে কথা, দায়িত্ব ভাগ হবে না তা কি হয়? কিন্তু ওই একটা ব্যাপার আছে না, 'বিভাগীয় প্রধান'। তো আমাদের বাংলা বিভাগের প্রধান তখন ছিলেন শঙ্করদা। না মানে, স্যারকে 'দাদা' বলায় চরম ক্ষেপলেও দাদা বলার অনুমতি পত্রটা পেয়েই গিয়েছিলাম। বয়সটা দাদা-বোনের না হলেও বিভাগের পাঁচ বিশিষ্ট জন বন্ধু ছাড়া কিছু নয়। যাই হোক, এই ভ্রমণের জন্য দশটা স্পট লিস্ট করে তাঁদের জানাতেই 'টাকী' ভ্রমণের সিদ্ধান্তে সকলেই রাজী। একটা দু-লাইনের কবিতা জমপেশ মাথায় জাঁকিয়ে বসেছিল -

টাকা দিয়ে ঘোরা হবে টাকী
আর টাক নিয়েই চেনা যা টাকী।।

যদিও প্রধানের কেশরাশির বদলে টাকই বেশি নজর কাড়ত। পঞ্চম সেমিস্টারের এক থেকে দুই সপ্তাহ আগে অর্থাৎ বছরের পয়লা মাসের তিন তারিখ শুভযাত্রা হবে। বিভাগের পঞ্চরত্ন ব্যক্তিদের নিয়ে আমাদের বারোজনের রাজসভায় মাঝে মধ্যে আলোচনা সভা বসতে লাগলো কীভাবে যাওয়া হবে, খাওয়া-দাওয়া এসব নিয়ে। যদিও খাদ্য বিষয়ে বরাবরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার থাকেই।

২ জানুয়ারি, ২০২৪....

পড়ুয়াদের সকলের থেকে বাড়ির হত্তা-কত্তাদের দেওয়া ছাড়পত্র পাওয়ার পরও প্রধানের ইচ্ছা হলো অভিভাবক বা অভিভাবিকাদের নিয়ে একটা গোল টেবিল বৈঠক বসানো হবে। এটা না হলেই বোধ করি ভালো ছিল। পঞ্চরত্নকে নিয়ে টেবিল বসলে এক এক করে শুরু হয় বাড়ির সবচেয়ে রাগী বাবা-মায়েদের বক্তব্য। আর এখানেই ঘটল এক বিপত্তি!

প্রথম অভিভাবক ঃ স্যার, দেখবেন নদীর কাছে যেন না যায়। খুব দুরন্ত আমার মেয়ে। নৌকায় একদম ওঠাবেন না।

দ্বিতীয় অভিভাবক ঃ স্যার, বোটে তুলবেন না ওদের। আর দেখবেন যেন বেশি রাত না হয়ে যায়। মেয়েকে ফোনে না পেলে, আপনাকে ফোন করব স্যার।

- আরে মশাই! কি মহা বিপদ। ঠিক এইজন্যই বাধা দিয়েছিলাম আমরা। তবুও বৈঠক বসিয়ে প্রধান নিজেই মহাচিন্তায় পড়েছিলেন। গুরুদের সঙ্গে ভ্রমণে যেতে দিতেই এই অবস্থা। ইতিহাসের যুগে এই বাবা-মায়েরাই, কীভাবে ছাড়তেন যুদ্ধবিদ্যা, ধ্যান ইত্যাদি শিখতে জঙ্গলে, আমি তো ভেবেই পাই না। যদিও এখনকার ছেলেমেয়েরাই তাদের কটু কর্মের জন্য দায়ী। প্রমাণিত সত্য হিসেবে দেখা গেলো অভিভাবকদের কথায় আমাদের স্যার ভয়ে বোটে চড়াবেন না সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে একটা গোপনীয় কথা - উনি আমাদের কাছে আবদার করেছিলেন যেন গঙ্গায় ওনাকে আমরা

ফেলে দিই। সংসারের অত্যাচারে বড়ো চাপে আছেন। তবে আমরা নেহাতই ভালো তাই আর এই পুণ্যের কাজটা করলাম না।

৩ জানুয়ারি, ২০২৪....

সকাল আট-টার মধ্যে কলেজে আসতে বলে প্রধান নিজেই সাড়ে আটটায় এসে পৌঁছোলেন। যদিও এতে ততটা অবাক হইনি, যতটা বেশি অবাক হয়েছি সকালে জল খাবার দেখে। ফলে পাকানো কেক, জয়নগর কী কৃষ্ণনগরের মোয়া আরও কী যেন ছিল। এই খেয়ে সবাই চলন্ত বাসে দুরন্ত নৃত্য করতে করতে বদহজমি সুখাদ্য ঢালতে ঢালতে যাবে ভেবে, শঙ্কর স্যার ও কান্তি স্যার পেয়ারা কিনে বাসে বিনামূল্যে পেয়ারা বিতরণ করেছিলেন। তার মাঝেই পরোপকার করতে গিয়ে এই শীতে চলন্ত বাসে ধুম-ধাম আছাড় খেয়ে শঙ্কর স্যারের পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়েছি। আর আমার উপরে বন্ধু অদিতি। কেউ যে আমার ওপর পড়ে গেছে, তা ঠাওরই হচ্ছিল না আমার। অতএব, নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে আমরা পৌঁছোলাম টাকী, বেলা ১টা নাগাদ। দুপুরের আহার ও বিশ্রামের জন্য ভোজনালয়ে ভোজন সেরে স্মৃতির যন্ত্রে কিছু স্মৃতি রাখলাম। এরপর বিশ্রামাগারে গা হেলিয়ে আরাম করে তারপর টোটোচালক দাদারা আমাদের নিয়ে বেরোলেন। স্রোতোস্বিনী ইছামতী নদী দেখলাম। অপূর্ব দৃশ্যপট, যার ওপারে বাংলাদেশ বর্ডার। কি সুন্দর লাগছিল দূরের ঘনত্বপূর্ণ শ্যামবনানীর অটুট গাঢ়ত্ব ও মৃত্তিকার সঙ্গে শিকড়ের মেলবন্ধন দেখতে। স্রোতস্বিনীর শীতল হাওয়া আর গ্রাম পরিবেশের মাটির সোঁদা গন্ধে ভাসতে ভাসতে পৌঁছে গেলাম গয়নার বাক্স সিনেমার শ্যুটিং স্পট। প্রাক্তন ভারতীয় সেনাকর্তা জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরীর বাড়ির ঠিক পাশেই অবস্থিত একটি পুরোনো বাড়ি। বাড়িটি কাদের বা এর কোনো অতীতের কথাও সঠিক আমার জানা নেই। তবে বাড়িটিতে প্রবেশ করা নিষেধ। শুধু তাই নয়, বিসর্জন সিনেমার শ্যুটিংও টাকীতেই হয়েছিল। এরপর আমরা গেলাম ছোটো সুন্দরবন গোলপাতার জঙ্গলে। নারকেল গাছের মতো ছোটো আকারের ম্যানগ্রোভ গাছের পাতা গোল না হলেও এর ফুলগুলি গোল হয় বলে এই ধরনের নাম। ইছামতী নদীর ধারে বাংলাদেশের বর্ডারের খুবই কাছে। এই জায়গায় নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা আছে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স অর্থাৎ বি এস এফ চেক পোস্টে আধার কার্ড জমা রেখে তবেই ভেতরে প্রবেশ করা যায়। রাজবাড়ি ঘাট থেকে নন্দদুলাল মন্দির, নজর ঘাটি অর্থাৎ ওয়াচ টাওয়ার, বাংলাদেশ ভিউ পয়েন্ট ইত্যাদি দেখার আছে। শীতকালে গেলে এসব জায়গায় খেজুরের রস, খেজুরের গুড় আর লোভনীয় কদবেল মাখা দেখলেই আপনার জিভে জল আসবে, আমার মতো। কিন্তু খাওয়া মানা, আগে ঘোরাঘুরি। এছাড়াও আছ জোড়া শিবমন্দির। ৩০০ বছরের পুরোনো এই শিব মন্দির এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। এরপর দেখলাম প্রাচীন জলের ট্যাঙ্ক। প্রায় ১০০-১৫০ বছরের পুরোনো এই ট্যাঙ্ক ব্রিটিশ আমলের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ব্রিটিশরা নিজেদের সুবিধার জন্য এই জলের ট্যাঙ্কটি নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে এটি একটি পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এরপর যাওয়া হলো পাখিরালয়ে। অসাধারণ বললেও কম বলা হয়। অদ্ভুত সুন্দর ও মনোরম জায়গা। নানা ধরনের পাখি দেখার সঙ্গে পার্কে খেলার মতো সুব্যবস্থাও আছে বাচ্চাদের

জন্য। সামনে দু-দিকে জল, মাঝখান দিয়ে ঘাসের চাদর বিছানো, প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্যও যথার্থ সুন্দর ও মনোরম এই লেকের দৃশ্যপট। বাচ্চাদের মতো খেলতে গিয়ে মারাত্মক ভয় পেয়েছিলাম। কারণ সামনেই দাঁত বার করা বাঘমামা দাঁড়িয়ে। কাকে খবর দেব বুঝে না পেয়ে একটা মোটা লোককে ডাকলাম। দেখি লোকটা নড়েও না, চড়েও না। বেজায় ক্ষেপে সামনে গিয়ে দেখি স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রের গোপালভাড় মিষ্টির হাঁড়ি আর এতো বড়ো সাইজের কাতলা মাছ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শ্বশুরবাড়ি যাবে বলে। হাঁড়ি থেকে কটা মিষ্টি টপাটপ খেয়ে নিয়ে গেলাম লম্বা গলার জিরাফকে ঘাস খাওয়াতে গিয়ে দেখি তার পিঠের মাঝখানে দিয়ে সবাই স্লিপ দিয়ে নামছে। ঘাস ফেলে আমিও দিলাম তাদের সঙ্গে যোগ। এরপর দেখি স্বয়ং ব্রহ্মদেব প্রজাপতির রূপে বসে। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে ক'টা ছবি তুলে, বিবাহের জন্য সুপাত্রের খোঁজ দিতে বলে আবার চললাম আরাম গৃহে। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম সেরে আবার বিকেল চারটের সময় রওনা দিলাম সকলে নিজ গৃহের উদ্দেশ্যে। ছয় চাকার ভিতরের শেষের নরম গদিতে হেলান দিয়ে বোনেদের আর বন্ধুদের উদ্দাম নেত্য দেখতে দেখতে জুস্ আর চিপস্ খেতে খেতে একটা গোটা দিন উপভোগ করলাম। আরও একটা দিন থাকলে আরও কিছু জায়গা দেখা হতো।

সত্যি বলতে এই দিনগুলো, সময়গুলো আর আসবে না। বিভাগের পাঁচজন বিশিষ্ট মানুষও সর্বদা থাকবে না। হাতে থাকা যন্ত্রের থেকে শরীরে থাকা স্মৃতিযন্ত্রের মধ্যে বেঁচে থাকবে এই ছবি বা মুহূর্তগুলো। শহুরে মানুষ গ্রাম্য পরিবেশ উপভোগ করলেও মানিয়ে কতটা নিতে পারে জানা নেই। তবে গ্রামের মানুষগুলোকে এখনও বোধ হয় বিজ্ঞান একশো শতাংশ দিয়ে গ্রাস করতে পারেনি। তাই হয়তো আবেগীয় উষ্ণ অভ্যর্থনা তারা জানায় অন্য কায়দায়। শহুরে মানুষ দেখলেই বাড়ির বাইরে এসে ঘোমটা দিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ঘোমটা দিতে এখনও ভোলেনি তারা। যে যুগের সভ্যতার আঁচে পোশাকের নির্লজ্জতা গ্রাস করেছে শহরকে, সেই সভ্যতায় দাঁড়িয়ে আজও গ্রাম্য বধূরা ঘোমটা টানে, শ্রদ্ধা জানাতে ভোলে না, রাখে না যত্নের ত্রুটি। কী অদ্ভুত, স্পর্শহীন এক মেলবন্ধন জগতে। প্রকৃতি স্বমহিমায়, নিজ রূপ-গুণে সৌন্দর্যের জাল বুনছে প্রতিনিয়ত। বোকা মানুষগুলো তাকেই কাঁটাতার দিয়ে বিচ্ছেদ করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে আসছে। তারা জানেও না, মহাজাগতিক শক্তিকে কোনোভাবেই টুকরো করা যায় না। এখানে ধরণী এক ও অভিন্ন, কারও সাধ্য নেই তাকে পৃথক করার। এখানে লাল রক্তের অধিকারী শিক্ষিতরা অর্থ ছাড়া কিছুই বোঝে না।

তবে শিক্ষার উদ্দেশ্যে হোক বা এমনিই - প্রকৃতির অপরূপ মায়া মানসিকভাবে সুস্থ রাখতে সক্ষম। যা হোক, ছাত্রীদের সঙ্গে একটা দিন কাটিয়ে মহামান্য বিচারপতিগণ বুঝেছিলেন এর মধ্যেই পরীক্ষার তারিখ ফেলতে হবে। তাই সুযোগ বুঝে মাসের পনেরো তারিখ পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র সমেত ফেলে দিলেন আমাদের।

খেলাধুলার গুরুত্ব

অনন্যা রায়, তৃতীয় সেমেস্টার

খেলাধুলা এবং ব্যায়াম, একটি সুস্থ শরীর ও মনের বিকাশে শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। আমাদের শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলাতেও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। খেলাধুলা বিশেষভাবে মানসিক চাপ কমায় এবং মেজাজ উন্নত করে, স্বাস্থ্যও ঠিক থাকে। খেলাধুলা স্বাস্থ্যকর। হাড় এবং পেশী তৈরি করে, ফিটনেস বাড়ায়, ঘুমের উন্নতি করে, তাদের সামাজিকীকরণে সহায়তা করে। এটি তাদের সহযোগিতার দক্ষতাও উন্নত করে, আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং স্থূল হওয়ার ঝুঁকি কমায়। নিয়মিত ব্যায়াম করার অনেক কারণ আছে। সর্বোপরি, এটি আপনাকে সুস্থ রাখে। উদাহরণ স্বরূপ, স্ট্র্যাথক্লাইড এবং ডান্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গেছে যে, নিবিড় ব্যায়াম ইংরেজি, গণিত এবং বিজ্ঞানে কিশোর-কিশোরীদের কর্মদক্ষতা বাড়িয়েছে, এখানে শুধুমাত্র কয়েকটি সুবিধা রয়েছে যা আপনি সন্তানদের মধ্যে বিকশিত হতে দেখতে পাবেন। কারণ, তারা আরও শারীরিক কার্যকলাপ শিক্ষার্থীদের সুস্থ থাকতে এবং অবাঞ্ছিত অসুস্থতা এড়াতে সাহায্য করতে পারে। এটি স্থূলতার ঝুঁকি কমায় এবং খেলাধূলার সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত চর্বি জমা হওয়া এড়াতে সাহায্য করে। এটি তাদের ফিট এবং স্লিম থাকতেও সাহায্য করে। বেশ কিছু গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, খেলাধুলা একটি শিশুর আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, কোচের কাছ থেকে হ্যান্ডশেক, তাদের সতীর্থের পিটেপ্যাট, প্রতিপক্ষের কাছ থেকে হাই-ফাইভ, বা বাবা-মা এবং বন্ধুদের কাছ থেকে শব্দের প্রশংসা ছাত্র হিসাবে তাদের আত্মমর্যাদা বাড়াতে পারে। এছাড়াও ক্রীড়া দলের একটি অংশ হওয়া তাদের সব বয়সের মানুষের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ করতে সাহায্য করে। আরও খোলা মনে বন্ধুত্ব করা এবং বৈচিত্র্যেকে সম্মান করা সহজ হয়ে যায়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং ম্যাচগুলির জন্য খুব ভাল সমন্বয়, দলগত কাজ এবং সহযোগিতা প্রয়োজন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে এই দক্ষতা শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবে, যখন তারা আগামীকালের ব্যক্তি হিসাবে বড়ো হবে। খেলাধূলা একটি দলের খেলোয়াড় হিসাবে তাদের ভূমিকাকে উন্নত করে যা শিক্ষাবিদ্ এবং ভবিষ্যৎ কেরিয়ার উভয়ক্ষেত্রেই গ্রুপ প্রকল্পের ক্ষেত্রে তাদের অনেক সাহায্য করে। ব্যর্থতা খেলাধুলার একটি অবমূল্যায়িত অংশ। জীবনে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন অধ্যাবসায় এবং কঠোর পরিশ্রম। খেলাধূলা এই গুণাবলী প্রদর্শনের সেরা চ্যানেলগুলির মধ্যে একটি। খেলাধুলা হল কঠোর পরিশ্রমের অর্থ দেখানোর একটি দুর্দান্ত উপায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন হবে অধ্যাবসায় এবং কখনও হাল না ছাড়ানোর মনোভাব। খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুরা

তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার সুবিধাগুলি শিখবে। শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা এবং কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত করা। এছাড়াও জীবনে ফিরে দেখতে হয় না, ইউনিভার্সিটি প্লেসমেন্ট দিয়ে তাড়াতাড়ি শুরু করা যায়। ভবিষ্যতের একাডেমিক সাফল্যের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করা। IBDP ছাত্রদের জন্য কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি প্লেসমেন্ট একটি বড়ো ভূমিকা পালন করে। কারণ তারা আগে থেকেই তাদের যাত্রার পরিকল্পনা করে এবং তাদের কলেজের পছন্দের উপর নির্ভর করে ডিপি প্রোগ্রামে তাদের বিষয় পছন্দ করে। সেপ্টেম্বর আসে এবং শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই তাদের ব্যক্তিগত বিবৃতি, সাধারণ পরিপূরক রচনা এবং সুপারিশের চিঠি নিয়ে ব্যস্ত থাকে, যদিও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা প্রকৃত আবেদনের তারিখের ৬ মাস আগে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা শুরু করে দেয়। খেলাধূলার সঙ্গে যুক্ত শিশুরা দেশব্যাপী বিভিন্ন দেশ ও শহরে ভ্রমণ করে, এটি শিক্ষার্থীদের জন্য দুর্দান্ত সুযোগ। এটি তাদের নাম, যশ-কে উন্নত করতে সাহায্য করে। একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখতে পুষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খেলাধুলার পাশাপাশি সেদিকেও সচেতন হতে হয়। স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করার মাধ্যমে শরীরকে সুস্থ রাখা সম্ভব। যেমন — চাল, ওটস, গম, বার্লি, বাদামী চাল, মাছ, মটরশুঁটি, বাদাম, দুধ, চিনাবাদাম, ভুট্টা ইত্যাদি। তাই সুস্থ খাবার গ্রহণ করার সঙ্গে খেলাধূলার অভ্যাস শরীরকে স্বাস্থ্যবান রাখতে সাহায্য করে।

অঙ্ক

সঞ্চিতা পাল, তৃতীয় সেমেস্টার

ঘটল একদিন করুণ ব্যাপার
সবে ক্লাস শুরু
স্যার বললেন দেখব খাতা
বুকটা দুরুদুরু
অঙ্কগুলো দেখেই তিনি
শূন্য বসান খাতায়
আমার দিকে তাকিয়ে বলেন
ভর্তি গোবর মাথায়
অঙ্কে যে তুই এত কাঁচা
জানেন কী তোর বাবা?
স্যারের কথা শুনে আমি
একেবারে হাবা।

আমিই সে...

শুভশ্রী সরকার
প্রাক্তনী, বাংলা বিভাগ

আমি যখন হারিয়ে যাবো, দিশাহীন এ পথে
তখন তুমি খুঁজো নাকো আমায়, এ তল্লাটে
এই শহরের নাক উঁচু সব মানুষগুলোর শান্তি নেই
আরাম নেই, তবুও আমি বোকার মতো এসব খুঁজি।
'তুমি'হীন এ শরীর। যেখানে হৃদযন্ত্র বিকল ...
অবিরাম চেষ্টা চালাই, তবুও আমি বিফল।
চোখের সামনে মস্ত শ্বেতপাথরের সিংহাসন,
তাতে বসে আছে — অহংকার, যুদ্ধ, স্বার্থ আর কাম।
আমি দেখলাম তাদের, এ তো আমার ঘর নয়!!
আমি বেরোলাম পথে-প্রান্তরে শান্তির আশায়
রাখবো ধরে বুকের মাঝে
আলো, হাওয়াহীন আমিও অপেক্ষারত,
ওই ভিখারীর মতো।।
যত্ন চাই তাহলেই উঠবো বেড়ে,
স্বর্ণলতার মতো করে।
আলুসেদ্ধ ভাতের মতো আরাম আর কিছুতে নেই
... হঠাৎ দেখি কালবোশেখী আস্ত একটা জন্তু
উড়িয়ে নিয়ে গেলো, একা করে গেলো আমায়।।
এখন আমার অনেক আরাম, বয়স হয়েছে তো!
তবুও যেনো শান্তি নেই, মেয়েটা খুঁজবো আর কত?
সংসারের ধুলো-বালি আজ আমায় গ্রাস করেছে,
হৃদ্‌পিন্ডটায় বুঝি মরচে ধরলো,
তবুও আশায় বাঁচি, যদি শান্তি ফেরে....

হারানো চিঠি

শ্রেয়া প্রামাণিক, তৃতীয় বর্ষ

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা গল্পের নাম উল্লিখিত চিঠি ঃ-

পূজনীয়া দিদি,

পত্রারম্ভে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ কর। এখন কেমন আছো জানাবে। মেজদিদির খবর কি? দেবদাসদা ও বিপ্রদাসদার চিঠি পেয়ে যে কি আনন্দ পেয়েছি তা সামান্য এই চিঠিতে কি আর বলব। বিরাজ বৌ-এর নববিধান-এর কথা শুনে দত্তা পিসিমা দিন দশেক হল এসেছে। এখানে এসে শ্রীকান্ত-এর সঙ্গে বামুনের মেয়ের পরিণীতা হওয়ার কথা জানতে পারায় সবসময় যেন গৃহদাহ চলছে। কেন না পল্লীসমাজ-এর মেয়ে চরিত্রহীন হলে চলে না। সংসারে এখন খুব অশান্তি দেখা দিয়েছে। পিসিমা অশান্তির জ্বালায় তার ভাই বৈকুণ্ঠের উইল-এর কথা সকলকে জানাতে বাধ্য হয়েছেন। রামের সুমতি হওয়ায় সকল দুষ্টুমি ভুলে গিয়ে পন্ডিতমশাই-এর কাছে রোজ পড়তে যাচ্ছে। আমাদের পাশের বাড়ির চন্দ্রনাথ ও তার ভাই কাশীনাথ-এর দেনাপাওনা নিয়ে কি ফাটাফাটিই না হল। হতভাগ্য পরেশ এই কর্মময় জীবন থেকে চিরদিনের মত নিষ্কৃতি পেয়েছে। এদিকে শুভদার মেয়ে ললনাকে নিয়ে গ্রামে বেশ কিছুটা অশান্তি চলছে। যাক - বিন্দুর ছেলেটা কেমন দেখতে হয়েছে? আমার গতবারের চিঠির শেষ প্রশ্নটার উত্তর দাওনি কেন? আশা করি চিঠি পেলেই উত্তর দেবে।

আমরা ভাল আছি।।

ইতি
তোমার স্নেহের বোন
রাজলক্ষ্মী

সমাপ্তি পর্ব

সুচরিতা ঘোষ

"মন চায় না দিতে বিদায়
কিন্তু আমরা সত্যিই বড় নিরুপায়
সময় চলে যাচ্ছে সময়ের মত
মনে করে দেখ স্মৃতি আছে কত"

বিদায় শুধুমাত্র একটা শব্দ নয়, এটা একটা অনুভূতি। যার প্রকাশ কখনো ভাষায় করা যায় না। যার জায়গা শুধুমাত্র আমাদের মনের কাছে। বিদায় সিঁড়ির সেই ধাপের মতো, যে ধাপ অতিক্রম করলে আমরা জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে উন্নীত হতে পারি। সমস্ত বিদায়ই নতুন বছরের সূচনা মাত্র।

বিদায় হল জীবনের সেই পর্যায়, যে পর্যায়ে এসে সমস্ত স্মৃতি মনের মণিকোঠায় বেঁধে, না চাইলেও পরবর্তী পর্যায়ে চলে যেতে হয়। বিদায় হল ট্রেনের সেই প্ল্যাটফর্ম যেখানে কিছু মানুষ আমাদের সঙ্গে চললেও কিছু মানুষ নেমেও পড়ে আবার তেমনি কিছু মানুষ উঠেও পড়ে দূরের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য।

বিদায় আমরা কেউ চাই না, কিন্তু বিদায় আমাদের নিতেই হয় সে স্কুল থেকেই হোক আর জীবন থেকেই হোক, এতো প্রকৃতির নিয়ম। কারণ আমরা যদি আমাদের জায়গা থেকে বিদায় গ্রহণ না করি তাহলে পরবর্তীদের আগমন ঘটবে না। তাই বিদায় আমাদের নিতেই হয়।

দিনটা ছিল ২২ জুলাই ২০২৪। রুমটা ছিল ১৪বি। যে ঘরে শুরু হয়েছিল আমাদের ১ম বর্ষের প্রথম ক্লাস ১৪ নভেম্বর, ২০২১। সেখানেই সমাপ্তি ঘটল আমাদের মহাবিদ্যালয় জীবনের। কত হাসি, কত কান্না, মনে কত অভিমান, কত সুখ, কত দুঃখ, কত বকা, কত ভালোবাসা সবই আটকে রইল ওই ৯ নম্বরের চার দেওয়ালের মধ্যে। ওহো! তোমাদের তো বলতেই ভুলে গেছি, আমাদের মহাবিদ্যালয়ের শুরু ও সমাপ্তিটা ১৪ বি-তে হলেও আমাদের মহাবিদ্যালয়ের দিনগুলো কিন্তু কেটেছে আমাদের বিভাগীয় ৯ নম্বর রুমে।

গার্লস কলেজ বললেই আমাদের সবারই মনে এক চেনা ছবি ভেসে ওঠে। সেই নিয়মের ঘেরাটোপে বাঁধা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কড়া অনুশাসনের মধ্যে বন্দী; আর বিদ্যালয়ের বন্ধুদের মতো বন্ধুত্বের অভাব। কিন্তু বিশ্বাস করো আমরা যারা মুরলীধর গার্লস কলেজের কলা বিভাগে পড়েছি, তাদের কাছে গার্লস কলেজের সংজ্ঞাটা একটু অন্যরকম।

তিন বছরের কথা তিন হাজার শব্দে লিখেও আমরা শেষ করতে পারব না। আর আমি তো এখানে তোমাদের সঙ্গে মাত্র কিছু কথা আলোচনা করছি। বলতে পারো কোন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নই আমাদের কলেজ ছেড়ে যাবার কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতে দিয়েছিল। কলেজের ৯ নম্বরের উপর অধিকার ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যেতে থাকল। জানো তো, আমরা না ২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী মহামারীর প্রকোপের কারণে আমাদের নবীন বরণ অনুষ্ঠান হতে পারেনি। তাই সবসময় স্যার ম্যামদের বলতাম, ''আমাদের কিন্তু বিদায় সম্বর্ধনা দিতেই হবে।'' কিন্তু এভাবে বলতে বলতে কখন যে সেই বিদায়ের দিনটা এসে গেল বুঝতেই পারলাম না। কেমন অজান্তেই যেন চোখের কোণায় জল চিক্‌চিক্ করে উঠেছিল। সেদিন সেই বিদায় সম্বর্ধনার অনুষ্ঠানে গিয়ে বারবার মনে হচ্ছিল এই দিনটা বোধ হয় না এলেই ভালো হত। সেদিন সবকিছুর আয়োজন শুধু আমাদের জন্যই হয়েছিল। কিন্তু কেন জানি না, সেই দিনটাতে পৌঁছে সমস্ত আনন্দ যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল

কলেজ ছেড়ে চলে যেতে হবে জেনে এক অজানা কষ্ট যেন বুকের মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছিল। সবকিছুই একরকম থাকবে - টেবিল, চেয়ার, চক, ব্ল্যাকবোর্ড, আলমারির বইগুলো.....সবকিছু। সবাই সবার অবস্থানে অপরিবর্তিত থাকবে। শুধু পরিবর্তন ঘটে যাবে আমাদের, কেবলমাত্র থাকব না আমরাই।

আমাদের আর একসঙ্গে বসে টিফিন খাওয়া হবে না। বন্ধুদের সঙ্গে খুনসুটি করা হবে না, কেউ সকাল হলেই কাউকে আর ফোন করে জিজ্ঞাসা করবে না, ''কি রে ক'টার ট্রেনে যাবি?'' হয়ত সবারই গন্তব্যস্থল আলাদা হয়ে যাবে। সবাই-এর সবাইকে মনে পড়বে কিন্তু ব্যস্ততার কারণে কারোরই আর কারোর সঙ্গে দেখা করার উপায় থাকবে না। যাদের সঙ্গে দেখা করে একসময় সমস্ত দুঃখ কষ্ট, মন খারাপ ভুলে থাকা যেত, এখন তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আগে থেকে পরিকল্পনা করতে হবে। ওই বাংলার '৯ নম্বরে' বসে স্যার, ম্যামদের পড়া আর শোনা হবে না, আড্ডা দেওয়া হবে না, বকা খাওয়া হবে না, আবদার করাও হবে না।

স্কুল জীবনের মত কলেজ জীবনটাও শেষ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। স্কুল জীবনটা যদি একটা উপন্যাস হয়, তো কলেজটা একটা ছোটোগল্প, আর ছোটোগল্পের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য হল - ''শেষ হইয়াও হইল না শেষ।'' তাই দাপ্তরিক সম্পর্কটা হয়ত শেষ হয়ে গেছে, কলেজের সঙ্গে হয়তো আমরা প্রাক্তনী হয়ে গেছি, কিন্তু হৃদয়ের সম্পর্ক থেকে যাবে আজীবন। সেখানে কখনোই আমরা প্রাক্তনী হবো না।

আমাদের বাংলা রাজসভায় আমরা ১২ জন সদস্য একান্নবর্তী পরিবারের মত ছিলাম। আমরা সেই কথা রেখেছি হাজারো মনোমালিন্যের মাঝে আমরা ১২ জন এক ছিলাম, এক আছি। ঝগড়া

তো সব পরিবারেই হয়, আমাদের পরিবারও তার ব্যতিক্রম নয়। তবুও আমরা পরিবারের সবাই একসঙ্গে হাতে হাত দিয়ে পথ চলতে পারি।

“সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়
যে জন বুঝে না তারে ধিক্ শত ধিক্
বলিছে সোনার ঘড়ি টিক টিক টিক।”

আমাদের পরিবারও ক্রমশ আমাদের একত্রিত যাত্রাপথের অন্তিম মুহূর্তে এসে পৌঁছে যায়, যেখান থেকে সামনে দেখলে মনে হয় অকূল সমুদ্র আর পিছনে দেখলে অনেক অনেক স্মৃতি।

ভালো থাকুক আমাদের মহাবিদ্যালয়, ভালো থাকুক আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা, ভালো থাকুক আমাদের বিভাগীয় ৯ নম্বর রুম, ভালো থাকুক আমার বন্ধুগণ। আবারো দেখা হবে হয়ত নতুন কোনো ঠিকানায়, নতুন কোন গানের ভোরে।

সবাইকে বিদায় ....